بسم الله الرحمن الرحيم

জুমুআর খুতবা (২৩ ডিসেম্বর ২০১১)

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)

বাংলা ডেস্ক নিজ দায়িত্বে খুতবার এই বঙ্গানুবাদ উপস্থাপন করছে।

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক যুক্তরাজ্যের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত ২৩ ডিসেম্বর ২০১১-এর (২৩ ফাতাহ্, ১৩৯০ হিজরী শামসি) জুমুআর খুতবা।

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم*

بسْم الله الرَّحْمَن الرَّحيم * الْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمينَ * الرَّحْمَن الرَّحيم * مَالك يَوْم الدِّين * إيَّاكَ نَعْبُدُ وَإيَّاكَ نَسْتَعينُ * اهْدنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقيمَ * صِرَاط الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْر الْمَغْضُوب عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ (آمين)

পৃথিবীতে যে-ই আসে তাকে একদিন বিদায় নিতে হয়। এটি প্রকৃতির নিয়ম, এ নিয়ম লঙ্ঘনের কোন সুযোগ নেই। আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনের কয়েক স্থানে كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ **অর্থাৎ** 'প্রত্যেক আত্মা মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে'-নাযেল করে এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে, মানুষকে মৃত্যুর কথা স্মৃতিতে জাগ্রত রাখা উচিত, এতে করে খোদা তা'লার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে। আল্লাহ্ তা'লা ধরাপৃষ্ঠে বরং এ বিশ্বজগতে বা জগত সমূহে যা কিছু আছে সবকিছু নিঃশ্বেষ হয়ে যাওয়ার সংবাদ দিয়েছেন কেবল নিজের স্বত্তাকে অবিনশ্বর আখ্যা দিয়েছেন। খোদা তা'লার স্বত্তাই যেহেতু চিরস্থায়ী তাই আল্লাহ্ তা'লা একজন মু'মিনের এ পৃথিবীর জীবন থেকে পারলৌকীক জীবনের প্রতি অধিক দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। যা বাস্তব এবং দীর্ঘ জীবন আর যাতে বান্দা আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ সমূহ মেনে চলার কারণে তাঁর পুরস্কাররাজির উত্তরাধিকারী হবে আর অস্বীকারের কারণে শাস্তি-যোগ্যও আখ্যা পেতে পারে। অতএব আমাদের মাঝে তারা-ই সৌভাগ্যশালী যারা এ পৃথিবীর তুলনায় পরকালকে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন এবং খোদা তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করেন। নিজেদের জীবনের সিংহভাগ সময় এমন ভাবে ব্যয় করেন অথবা কাটানোর চেষ্টা করেন যাতে সেই প্রকৃত বন্ধু সন্তুষ্ট হন। ধর্মকে দুনিয়ার উপর প্রাধান্য দেন আর এ নিমিত্তে সকল প্রকার ত্যাগ স্বীকারের জন্য প্রস্তুত থাকেন। তারা এত অগ্রসরমান থাকেন যে, ধর্মের সেবা ছাড়া তাদের অন্য কোন চাওয়া পাওয়া থাকে না। এটিও যেহেতু খোদা তা'লার নির্দেশ যে, বান্দার প্রাপ্য অধিকার প্রদান কর আর এটি ধর্মের শিক্ষা, এ কারণে তারা অন্যদের অধিকার প্রদানে

সোচ্চার থাকে। নিজেদের অঙ্গীকার সমূহকে খোদা তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য পালন করেন। আর এ দায়িত্ব পালনে পথের কোন প্রতিবন্ধকতার প্রতি তারা ভ্রুক্ষেপ করেন না। স্বাচ্ছন্দে-অ-স্বাচ্ছন্দে, স্বচ্ছলতা-অ-স্বচ্ছলতা, অসুস্থতায়-সুস্বাস্থ্যে তাদের জীবনের একটিই উদ্দেশ্য থাকে যে, আমরা আমাদের খোদার সাথে যে অঙ্গীকার করেছি তা যেন পালন করতে পারি। আমার হাতে যে আমানত রয়েছে সে সক্রান্ত দায়িত্ব যেন পালন করতে পারি। এমন মানুষই সে সকল লোকদের মাঝে গণ্য হয়ে থাকে যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ (সূরা আল্ বাকারা: ২০৮) অর্থ: এবং লোকদের মাঝে কতক এমনও আছে যারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির খাতিরে নিজেদের প্রাণকে বিক্রি করে দেয়।

তাদের চেহারায় সর্বদা একটি শান্তি বিরাজ করে, শান্তি প্রাপ্ত আত্মা বা নফসে মুতমাঈন্না'র তারা মূর্ত প্রতিক হয়ে থাকেন। সম্প্রতি এমন গুণাবলীর অধিকারী আমাদের একজন বুযূর্গ মৃত্যু বরণ করেছেন যিনি নিঃসন্দেহে জামাতের মহামূল্য সম্পদ ছিলেন। তাঁর নাম মোহতরম সৈয়দ আব্দুল হাই শাহ্, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

আল্লাহ্ তা'লা তাকে স্বীয় প্রিয়দের সান্নিধ্য দান করুন আর জামাতের এই ক্ষতিকে কেবল স্বীয় অনুগ্রহে পূর্ণ করে দিন। তাঁর অগণিত স্থলাভিষিক্ত সৃষ্টি করুন যেন আহমদীয়াতের এই কাফেলা সদা দ্রুততার সাথে স্বীয় গন্তব্যের দিকে ধাবিত থাকতে পারে। এ সময় আমি সৈয়দ আব্দুল হাই সাহেবের সংক্ষিপ্ত স্মৃতিচারণ করব। জনাব শাহ্ সাহেব ১২ জানুয়ারী, ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে কাশ্মীরের কুরিল জেলায় অনন্তনাগে জন্মগ্রহণ করেন। এরপর তিনি কাদিয়ান চলে আসেন আর এখানেই বড় হন। কাদিয়ান আসার পর পাক-ভারত বিভক্ত হলে তিনি পাকিস্তানে চলে আসেন। তাঁর মা কাশ্মীরেই অবস্থান করছিলেন। মা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার চল্লিশ বছর পর তিনি তাঁর মায়ের সাক্ষাৎ লাভ করেন। চল্লিশ বছর পর্যন্ত তিনি মায়ের সাথে দেখা করার সুযোগ পান নি। কেবলমাত্র ধর্মের খাতিরে তিনি এ বিচ্ছেদ সহ্য করেছেন।

তাঁর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস হল, দাদা সৈয়দ মুহাম্মদ হুসাঈন শাহ্ শ্রীনগরের খানইয়ার মহল্লার অধিবাসি এবং গিলানী সৈয়দ বংশের সন্তান ছিলেন। উক্ত বংশের লোকেরা ধর্মীয় মতানৈক্যের দরুন পৈত্রিক এলাকা পরিত্যাগ করে নাডওয়াতে বসতি স্থাপন করেছিল। তাঁর এক পুত্র সৈয়দ আব্দুল মান্নান শাহ্ সাহেব যিনি যৌবনে বরং বাল্যকালেই আহমদীয়াত গ্রহণ করেছিলেন এবং পীর-মুরিদ ব্যবসাকে আহদীয়াতের কারণে পরিত্যাগ করেন। অতি বিনয় ও দিনতার বেসে জীবন যাপন করেছেন। জম্মু ও কাশ্মীর সংক্রান্ত আহমদীয়াতের ইতিহাস অধ্যায়ে জনাব আব্দুল হাই শাহ্ সম্বন্ধে লেখা হয়েছে, জনাব সাইয়েদ আব্দুল হাই শাহেদ ১৯৪১ সালে কাদিয়ান আসেন এবং ১৯৪৫ সালে ইসলামের জন্য জীবন উৎসর্গ করেন এবং মাদ্রাসা আহমদীয়ায় ভর্তি হন। দেশ বিভাগের পর ১৯৪৯ সালে জামেয়াতুল মুবাশ্‌শিরিন থেকে শাহেদ পাশ করেন এবং পরবর্তীতে সফলতার সাথে আরবীতে এম.এ করেন এবং গবেষণামূলক কাজে নিয়েজিত থাকেন। দীর্ঘ সময় পর্যন্ত তিনি খোদ্দামুল আহমদীয়ায় কাজের সুযোগ লাভ করেন। দু'তিন বছর মাসিক আনসারুল্লাহ্ এবং জামেয়ার

সাময়ীকির সম্পাদক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। প্রায় বার-তের বছর খালেদ ও তাশহিযুল্ আয্হানের প্রকাশক ছিলেন। জিয়াউল ইসলাম প্রেসের ম্যানেজার এবং প্রকাশক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। আল-শির্কাতুল ইসলামিয়ার ম্যানেজিং ডাইরেক্টর ও আল্ ফযল বোর্ডের প্রেসিডেন্ট এবং এমটিএ পাকিস্তানের প্রথম ম্যানেজিং ডাইরেক্টর ছিলেন। ফজলে ওমর ফাউন্ডেশন ও তাহের ফাউন্ডেশনের ডাইরেক্টর, নাযের ইশায়াত এবং বিভিন্ন কমিটির সদস্য ছিলেন। ভারপ্রাপ্ত নাযেরে আলা এবং ভারপ্রাপ্ত স্থানীয় আমীরের দায়িত্ব পালনেরও সৌভাগ্য তিনি লাভ করেছেন।

কাশ্মীরী ভাষায় পবিত্র কুরআনের যে অনুবাদ করা হয় তিনি তা পরিমার্জনের সুযোগ পেয়েছেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর রচনাসমগ্র অর্থাৎ রূহানী খাযায়েনের কম্পিউটারাইজড সংস্করণ প্রস্তুতির তত্ত্বাবধান করেছেন। বিভিন্ন পুস্তকাদির সূচীপত্র প্রস্তুত করেছেন এবং এগুলোর মুখবন্ধ ও ভূমিকা স্বয়ং লিখেছেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-কৃত কুরআনের অনুবাদের ক্ষেত্রে তাঁর অনেক অবদান রয়েছে। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর বক্তৃতাসমূহের আলোকে প্রণীত পুস্তক 'হোমিও প্যাথী'র কাজে সর্বাত্মক ভূমিকা রেখেছেন।

তিনি অত্যন্ত জ্ঞানী, সহজ-সরল, ভদ্র, বিচক্ষণ, নম্র স্বভাব, সুপরিকল্পক, স্বল্পভাষী কিন্তু সদা সুচিন্তিত কথা বলতেন। জ্ঞানের ক্ষেত্রে সমৃদ্ধ পটভূমির কারণে সব বিষয়ের গভীর অনুসন্ধান করতেন এবং দৃঢ় মতামত ব্যক্ত করতেন। খলীফাদের পক্ষ থেকে প্রাপ্ত বিষয়বস্তুসমূহের গবেষণা এবং উদ্ধৃতিসমূহ খুঁজে বের করার কাজ যত দ্রুত সম্ভব সমাধা করার চেষ্টা করতেন। পুস্তক সংকলন থেকে আরম্ভ করে প্রকাশ পর্যন্ত প্রত্যেক স্তরে নিজ কর্মীদের তদারকি করতেন এবং অতি বস্তুনিষ্ট পরামর্শ প্রদান করতেন। এগুলো ছিল তাঁর কাজ সংক্রান্ত গুরত্বপূর্ণ কিছু কথা।

নাযের ইশায়াতের প্রকাশনা সম্পর্কে জ্ঞান থাকা বাঞ্ছনীয়। তিনি আল্ ফযল এবং অন্যান্য পত্র-পত্রিকার প্রিন্টার ও প্রকাশক ছিলেন। ছাপার কাগজ চেক করার ক্ষেত্রে তাঁর বিশেষ দক্ষতা ছিল। ছাপার মেশিনের প্রত্যেকটি অংশ, এর ধরন, প্রযুক্তিগত জ্ঞান ছিল তাঁর নখদর্পনে। এভাবে পুস্তক প্রকাশনা হোক অথবা পত্রিকা ছাপানো, সকল বিষয়ে সুনির্দিষ্ট এবং বস্তুনিষ্ঠ দিক নির্দেশনা প্রদান করতেন। এছাড়া আব্দুল হাই সাহেব সম্পর্কে আল্ ফযলে ধারাবাহিকভাবে লেখা হয়েছে যে, এপ্রিল ১৯৪৫ সালে তিনি জীবন উৎসর্গ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন কিন্তু ওয়াকফের অঙ্গীকারনামার ফর্ম ১৯৫০ সালের ১১ নভেম্বর পূরন করেছিলেন। আর আমি পূর্বেও বলেছি, তিনি অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ালেখা করেছিলেন এরপর জামেয়াতে ভর্তি হন এবং জামেয়াতে অধ্যয়নরত অবস্থায় মেট্রিক পরীক্ষা দেন এবং বোর্ডে ৬ষ্ট স্থান অধিকার করেন। জামেয়াতেও আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় প্রতিবছর প্রথম স্থান অধিকার করতেন। এমনিভাবে মৌলভী ফাযেল পরীক্ষায় পুরো প্রদেশে প্রথম স্থান অধিকার করেন।

১৯৫৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তাঁর প্রথম নিয়োগ হয় এবং বিভিন্ন বিভাগে তিনি দায়িত্ব পালন করেছেন। ১৯৮২'র ২৯ জুন, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) তাঁকে

নাযের ইশায়াত বা নাযের প্রকাশনা নিযুক্ত করেন এবং হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর জ্ঞানগর্ভ কুরআনের দরসের জন্য বিভিন্ন উদ্ধৃতি খুঁজে বের করে সহযোগিতার সম্মান লাভ করেন। প্রতিদিন রাত তিনটা পর্যন্ত নিজ টিমের সাথে বসে তিনি এ কাজ সম্পন্ন করেছেন। যতক্ষণ পর্যন্ত পুরো কাজ সম্পন্ন করে লন্ডনে ফ্যাক্স না করতেন ততক্ষণ বিশ্রাম নিতেন না। খুতবা ও অন্যান্য বিষয়েও গবেষণামূলক কাজ এবং হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর কুরআন অনুবাদ এবং হোমিওপ্যাথি পুস্তক প্রনয়ণ টিমের সদস্য ছিলেন। এ ব্যাপারে তাঁর প্রতি অর্পিত দায়িত্ব খুবই সুন্দরভাবে সমাধা করেছেন। কুরআন করীমের অনুবাদকল্পে পাঞ্জাবি, সিন্ধী, পশতু এবং সারাইকী ভাষায় অনুবাদ প্রস্তুত ও প্রকাশের সুযোগ তাঁর হয়েছে।

একবার ১৯৯৭ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) তাঁকে সাধুবাদ জানাতে গিয়ে বলেন, সৈয়দ আব্দুল হাই সাহেবের এই গুণটি আমি দেখেছি, যখনই তাঁকে নির্দিষ্ট কোন কথা বুঝানো হয়, সে ব্যাপারে তাঁর যদি জানা না-ও থাকে তিনি উক্ত ব্যাপারে অভিজ্ঞ লোকদের খোঁজ করা আরম্ভ করেন আর আমি তাঁকে কোন পুস্তকের কথা বলেছি আর তিনি তা হুবহু প্রস্তুত করেন নি, এমনটি কখনো হয় নি। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় গভীর বিচক্ষণতার অধিকারী এবং সুগভীর দৃষ্টিতে তিনি সবকিছু পাঠ করেন।

এরপর ২০০৮ সালে আমি যখন তাঁকে বললাম, কম্পিউটারাইজড রূহানী খাযায়েন প্রকাশ ও প্রিন্ট হওয়া প্রয়োজন তখন তিনি কঠোর পরিশ্রমের সাথে উক্ত কাজ সম্পাদন করেছেন। এই নতুন কম্পিটারাইজড (রূহানী খাযায়েনের) সংস্করণের অনেক বিশেষত্বের মাঝে আব্দুল হাই শাহ্ সাহেব এ বিষয়ের প্রতিও লক্ষ্য রেখেছেন যে, এ রূহানী খাযায়েনের পৃষ্ঠা নম্বর যেন পূর্বের রূহানী খাযায়েনের অনুরূপ থাকে যাতে জামাতী লিটারেচারে অর্ধ শতাব্দী ধরে যেসব উদ্ধৃতি চলে এসেছে সেগুলো অন্বেষণ সহজসাধ্য হয়। এ ছাড়াও উক্ত সেটে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কতক প্রবন্ধ এবং আরবী নযম ইত্যাদি যা কোন কারণে পূর্বে প্রকাশ করা হয়নি, তা-ও এতে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

পবিত্র কুরআনের যে উর্দূ অনুবাদ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে, এর শুরুতে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন শিরোনামে তিনি লিখেছেন, **'কুরআন করীমের এই যে অনুবাদ পেশ করা হচ্ছে, এটি প্রস্তুত করতে আমার সাথে লন্ডনের আলেমগণের একটি দল লাগাতার কাজ করেছেন, এমনিভাবে কেন্দ্র রাবওয়াতেও আলেমদের একটি টিম নাযের ইশায়াত সৈয়দ আব্দুল হাই শাহ্ সাহেবের নেতৃত্বে অনুবাদের পরিমার্জন করে অতি মূল্যবান পরামর্শ এবং মতামত দ্বারা আমাকে সাহায্য করেন। তাঁদের সম্মিলত প্রচেষ্টা না থাকলে আমার একার পক্ষে একাজ সম্ভব ছিল না'**।

পাকিস্তানের সংসদে যে মাহযার নামা (স্মারক লিপি) পেশ করা হয়েছিল তা ছাপার পর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) তাঁর ১৯৯৭ সালের এক পত্রে বলেন, **'মাহযার নামা যা প্রকাশিত হয়েছে তা খুবই উত্তম হয়েছে। আমি যারপরনাই আনন্দিত, মাশাআল্লাহ্ আপনি অত্যন্ত পরিশ্রম ও বুদ্ধিমত্তার সাথে কাজ করে থাকেন'**। এরপর এক পত্রে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) শাহ্ সাহেবকে লিখেছেন, **'আপনার ওমুক তারিখে প্রেরিত**

রিপোর্ট হস্তগত হয়েছে। মাশাআল্লাহ্ ভরপুর কাজ করছেন যা অত্যন্ত ফলপ্রদ। আল্লাহ্ তা'লার ফযলে আপনি একমাত্র নাযের, যাকে ন্যস্ত দায়িত্ব পালনের কথা স্মরণ করানোর প্রয়োজন কখনো পড়েনি। জাযাকুমুল্লাহু আহসানুল জাযা, আল্লাহুম্মা যিদ ওয়া বারেক। (এরপর লিখা আছে আল্লাহ্ তা'লা আপনাকে দীর্ঘ সুস্থ জীবন দান করুন)'

আল্লাহ্ তা'লা তাকে প্রচুর কাজ করার সুযোগ দিয়েছেন। এ সমস্ত প্রশংসা-সূচক বাক্য তাঁকে অধিক বিনয়ী করেছে এবং পরিশ্রমের প্রতি মনোযোগ বৃদ্ধি করেছে। এমনটি কখনও ভাবেন নি যে প্রশংসা করা হয়েছে তাই কাজের গতি শ্লথ হয়ে গেলে কোন অসুবিধা নেই।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)'র যুগে পাকিস্তানে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দশ খন্ডের মলফুযাতকে পাঁচ খন্ডে রূপ দেয়া হয়েছে। এসব খন্ডে বিদ্যমান সকল কুরআনের আয়াতের রেফারেন্স সংযুক্ত করা হয়েছে। প্রয়োজন অনুযায়ী নতুন শিরোনাম দেয়া হয়েছে। পাঠকের সুবিধার্থে প্রত্যেক খন্ডের পিছনে বিষয় বস্তু, কুরআনের আয়াত, স্থান ও নাম সমূহের সূচী নতুনভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছে। কিন্তু তিনি যখন এ বছর জলসায় এসেছিলেন তখন আমি তাকে বলেছি, পাঁচ খন্ডের পরিবর্তে পুনরায় এটি দশ খন্ডে বদলে দিন আর সেখানেও (রাবওয়াতে) এ ভাবেই প্রিন্ট হলে ভাল হবে। তিনি সামান্যতম দিরুক্তি করেন নি; বলেন নি যে, আমরা এত পরিশ্রম করে এটিকে পাঁচ খন্ড আকারে প্রকাশ করেছি বা এভাবে এর সূচী বানিয়েছি এখন পুনরায় এটিকে পৃথক পৃথক ভাবে প্রকাশ করতে কষ্ট হবে। কোন প্রকার দিরুক্তি না করে তিনি তৎক্ষণাৎ বলেন, ঠিক আছে আমি এটি পুনরায় দশ খন্ডে প্রকাশ করা শুরু করছি, কেননা ছোট ছোট খন্ড হলে পড়তে বেশী সুবিধা হবে। মলফুযাত হলো হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর উক্তি বা বক্তৃতা সমূহের সংকলন। সফরে, ভ্রমনে, বিশ্রামে এক কথায় যে কোন অবস্থায় মানুষ এটি পড়তে পারে। খন্ড ছোট হলে আমার মনে হয় ভারি খন্ডের তুলনায় বেশি সুবিধা হয়, পড়ার সুবিধা হয়। যাহোক, তিনি তৎক্ষণাৎ কাজ আরম্ভ করে দিয়েছেন।

একইভাবে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)'র তত্ত্বজ্ঞানে ভরপুর ও দুস্প্রাপ্য জ্ঞান ভান্ডার দশ খন্ডের তফসীরে কবীর আকারে প্রকাশিত রয়েছে। তিনি পাঠকের সুবিধার্থে এর বিস্তারিত ও উৎকর্ষ ধরনের সূচী বানিয়ে দিয়েছেন যাতে নাম, ভৌগলিক গুরুত্ব রাখে এমন স্থান এবং কঠিন শব্দের সমাধান ভিত্তিক উৎষর্ক সূচী রয়েছে। তিনি আঞ্জুমানের বিভিন্ন কমিটি যেমন পরামর্শ প্যানেল, আহমদীয়াতের ইতিহাস বিভাগ, মজলিসে ইফতা, খিলাফত লাইব্রেরী কমিটি, পরিকল্পনা প্রণয়ন কমিটি, অডিও-ভিডিও ক্যাসেট সংরক্ষণ কমিটি, তবার্‌রুক সংরক্ষণ কমিটি এবং খিলাফত শতবর্ষ জুবিলী কমিটির সদস্য ছিলেন। তেমনিভাবে তিনি আল্লাহ্‌র রাস্তায় কারাবাসের সম্মানও লাভ করেন। আল্ ফযল বোর্ডের তিনি সভাপতি ছিলেন। আব্দুল হাই শাহ্ সাহেব হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.)-এর সাথে তাঁর প্রথম সাক্ষাতের উল্লেখ করে বলেন, হুযূরের গাম্ভির্যপূর্ণ ব্যক্তিত্ব এবং তাঁর স্নেহ সম্পর্কে আমার এটিও মনে পড়ে, হুযূর জামাতের কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ আমার উপর ন্যস্ত করেন। সে বিভাগ সংক্রান্ত প্রথম সাক্ষাতে হুযূর যখন খাকসারকে ডেকে পাঠান আমি হুযূরের সামনে যাই তখন হুযূরের প্রতাপে আমার হাত কাঁপছিল। হুযূর খুব স্নেহের সাথে

আমাকে বললেন, ভয় পাবার কি আছে? আমার কাছ থেকে কাজ ভালভাবে বুঝে নেবে এবং পূর্ণ নিষ্ঠার সাথে তা সমাধা করবে। এরপর আমার হাত নিজের হাতে নিলেন যার কল্যাণে আমার সে অবস্থা ক্রমশঃ কেটে যেতে লাগলো। হুযূর তড়িঘড়ি করে কারো উপর ভরসা করতেন না, কিন্তু যখন কাউকে বিশ্বাস ও ভরসা করতেন, গভীর স্নেহ ও দিক নির্দেশনা প্রদান, ভুল-ভ্রান্তি উপেক্ষা ও মার্জনাসূলভ ব্যবহার অব্যহত রাখতেন।

তিনি লিখেন, এক মামলায় আমার বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারী হয়। পাকিস্তানের পত্র-পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশকগণের বিরুদ্ধে প্রায়শঃই ওয়ারেন্ট জারী হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে তাঁর বিরুদ্ধেও গ্রেফতারী পরোয়ানা জারী হয়। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহ.) যখন এটি জানতে পারেন, তিনি তাকে ডাকেন, সাথে উকীলদেরও ডাকেন এবং মিটিং হয়। তিনি লিখেন, তাঁর চলে আসার পর হুযূর তাঁর এক ছেলেকে এই বলে পাঠান, আব্দুল হাইকে গিয়ে বল, 'ঘাবড়ানোর কিছু নেই আমি তার জন্য দোয়া করব'। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.)-এর ছেলে বর্ণনা করেন, আপনার চলে যাওয়ার পর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) আমাকে ডেকে বললেন, দেখো কিছুক্ষণ আগে এখান থেকে শাহ্ সাহেবরা বেরিয়ে গেছেন। তার বিরুদ্ধে মামলা আছে। লাহোর বা ইসলামাবাদ যাওয়ার কথা ছিল। তিনি বলেন, এখনো হয়তো যান নি। তাদের গিয়ে বল, তাদের যাওয়ার পরপরই কাতরচিত্তে আমি দোয়া করছিলাম, তখন আল্লাহ্ তা'লা এ পংক্তি আমার মুখ থেকে নিসৃত করেন, **'তিনি তার পুণ্যবান বান্দাদের কখনো বিনষ্ট করেন না'**। এ জন্য চিন্তার কিছু নেই। বড় ভয়ানক মামলা সাজানো হয়েছিল তার বিরুদ্ধে কিন্তু এর কিছু দিনের মধ্যেই ঐ মামলা নিঃশেষ হয়ে যায়।

অতএব হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.)-কে আল্লাহ্ তা'লার এটি বলা এ প্রমাণ বহন করে যে, আল্লাহ্ তা'লার দৃষ্টিতে জনাব শাহ্ সাহেব পুণ্যবান বান্দাদের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন যারা আল্লাহ্ তা'লার আশ্রয়ে থাকেন। পরবর্তীতে অন্য একটি মামলায় তাঁকে আল্লাহ্ তা'লা আসীরে রাহে মওলা (আল্লাহ্র পথে বন্দী) হবার সৌভাগ্য দান করেন।

তাঁর বিরুদ্ধে এই যে মামলা হয়েছিল বা সাজানো হয়েছিল, এর প্রেক্ষাপটে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পংক্তি **'ইয়েহ্ হ্যায় পাঞ্জতন জিন পার বিনা হ্যায়'**, অর্থাৎ এরাই হলো পাঁচজন যাদের উপর ভিত্তি। এটি লাজনা ইমাইল্লাহ্র পক্ষ থেকে প্রকাশ করা হয়। লাজনার সেক্রেটারী, তাদের লিপিকার মোহাম্মদ আরশাদ সাহেব এবং সৈয়দ আব্দুল হাই শাহ্ সাহেবের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয় আর আব্দুল হাই শাহ্ সাহেব এবং মোহাম্মদ আরশাদ সাহেবকে কয়েক দিন হাজতে রাখা হয় এবং তাঁদের বিরুদ্ধে কয়েক মাস মামলা চলতে থাকে।

একজন মুরুব্বী সাহেব লিখেছেন, শাহ্ সাহেব বর্ণনা করেন, ওয়াকফে যিন্দেগীগণ প্রথম যুগে খুব সামান্য বেতন পেতেন যা দিয়ে খুব কষ্টে দিনাতিপাত করতে হত। শাহ্ সাহেব বলেন, আমার শ্বশুর একবার আমাকে বলেন, তুমি জাগতিক পড়ালিখা অনেক করেছ। জাগতিক কাজকর্ম করে আয় রোজগার কেন করো না? ঐদিকে কেন যাওনা। শাহ্ সাহেব বলেন, আমি তাকে বললাম, আমি দু'টি অঙ্গীকার করেছি। একটি অঙ্গীকার হলো,

আপনার মেয়ের সাথে বিয়ের অঙ্গীকার অপরটি ওয়াক্‌ফ হিসেবে খোদার সাথে জীবন উৎসর্গের। এখন আপনি বলুন, কোন অঙ্গীকার ভঙ্গ করবো? আবার বলেন, কিছুক্ষণ পরেই তাঁকে আমি বললাম প্রথম অঙ্গীকার পূর্ণ করে দ্বিতীয় অঙ্গীকার ভঙ্গ করা কীভাবে সিদ্ধ হতে পারে? এটা শুনে, তাঁর শ্বশুর চুপ হয়ে গেলেন, আর ভবিষ্যতে কখনও এ বিষয়ে কোন কথা বলেন নি। শাহ্ সাহেব বলেন, খোদা তা'লার কৃপায় এরপর সারাজীবন খোদা তা'লা আমাকে অঢেল দিয়েছেন। পূর্ববর্তী বুযূর্গদের এটাও একটা নেক স্বভাব ছিল, তাঁর শ্বশুর সাময়িকভাবে তাঁর অবস্থা দেখে মানবিক সহজাত প্রবণতার বশবর্তী হয়ে এ কথা ভাবলেন কিন্তু তাঁর উত্তর শুনে সম্পূর্ণভাবে চুপ হয়ে যান। খোদার সাথে অঙ্গীকার ভঙ্গের কথা এক আহমদী কখনো ভাবতেও পারে না। আর এর মাধ্যমে শাহ্ সাহেবের আল্লাহ্‌র প্রতি নির্ভরশীলতার মানও স্পষ্ট হয়। ঐ সময় খোদার উপর নির্ভরশীলতা ও অঙ্গীকার রক্ষার আবেগকে খোদা তা'লা এমনভাবে কল্যাণমন্ডিত করেছেন, তিনি বলতেন, সারা জীবন কখনো আমার অভাব হয়নি। তিনি নিজের অধিনস্থদের সাথে উত্তম ব্যবহার প্রদর্শন ও তাদের আবেগের প্রতি খুবই শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তাঁর একাউন্টেন্ট বলেন, শাহ্ সাহেবের সাথে পনের বছর কাজ করেছি। আমার একটি ঘটনা ছাড়া আর কোন ঘটনা স্মরণ নেই যখন তিনি খুবই রাগের বর্হিঃপ্রকাশ করেছেন। আর এটা হয়েছিল কোন ভুল বুঝাবুঝির কারণে। আমরা এক দপ্তরকে কিছু বই মোহতরম শাহ্ সাহেবকে না বলে পাঠিয়ে দেই। যখন কোন বন্ধু এই বিষয়ে মোহতরম শাহ্ সাহেবকে অবহিত করেন, তখন শাহ্ সাহেব খুবই রাগ করেন। আর শাহ্ সাহেবের অসন্তুষ্টির কারণে আমি দু'দিন তাঁর কামরায় যাইনি। দু'দিন পর তিনি আমাকে তাঁর কক্ষে ডাকেন আর মুচকি হেসে তাঁর সামনে বিস্কুট ইত্যাদি যা ছিল আমাকে খেতে দিলেন।

তাঁর সাহায্যকারী কর্মচারী মোহাম্মদ ইকবাল সাহেব লিখেছেন, বিশ বছর ধরে দেখছি, তিনি সর্বদা ছেলের মত আমাদের সাথে ব্যবহার করতেন। কর্মচারীদের সাথে সর্বদা অত্যন্ত স্নেহ ও ভালোবাসার ব্যবহার করতেন। একেবারে সহজ-সরল জীবনে অভ্যস্ত ছিলেন। তিনি কোন কর্মচারীকে সাহায্য করলে অন্যকে এটা জানতে দিতেন না। এভাবে নিজের কোন ব্যক্তিগত কাজ করালে বিনিময়ে প্রতিদান দিতেন। কোন কর্মচারীর সন্তানের বিয়ে হলে যতটুকু সম্ভব হতো তিনি সাহায্য করতেন। এছাড়াও অগণিত অভাবীদের তিনি সাহায্য করতেন।

এখানকার (লন্ডনের) আরবী ডেস্কের জনাব আব্দুল মজীদ আমের সাহেব, তাঁর জ্ঞানের গভীরতা সম্পর্কে লিখেছেন, যখন থেকে খাকসার রূহানী খাযায়েন অনুবাদ শুরু করেছে তখন থেকে তাঁর সাথে যোগাযোগ স্থাপিত হয়। কোন কোন কঠিন বাক্যের সমাধানের জন্য তাঁর দিক-নির্দেশনা ও পরামর্শ নেয়ার প্রয়োজন হতো। মোহতরম শাহ্ সাহেব প্রত্যেক বার অধমকে হাসি মুখে অত্যন্ত গবেষকসূলভ, জ্ঞানগর্ভ এবং যথাসময় দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। অধম যখনই কোন কিছু জিজ্ঞেস করতো তার উত্তর হতো যুক্তিপ্রমাণে সজ্জিত, মন মত এবং প্রশ্নের সকল দিক সামনে রেখে উত্তর দিতেন একই সাথে তা তাঁর

স্নেহ ও মহান চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে সজ্জিত হতো। অধম কোন পরামর্শ দিলে হাসিমুখে তা গ্রহণ করতেন। তাঁর স্নেহের এই ধারা শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত অব্যহত ছিল।

মুবাশ্বের আইয়াজ সাহেব লিখেন, জামেয়া আহমদীয়ার বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় পুরস্কার বিতরণের জন্য সিলসিলার বুযূর্গদের মধ্য থেকে বিশেষ বিশেষ অতিথিদের ডাকা হয়ে থাকে। এক বছর জামাতের যে বুযূর্গকে ডাকা হয় তার পরিচয় দিতে গিয়ে জামেয়ার মোহতরম প্রিন্সিপাল সাহেব বলেন, কর্মী অনেক ধরনের হয়। কেউ এমন হন যারা এক হাতে কাজ করেন এবং অন্য হাতে তালি বাজাতে থাকেন অর্থাৎ নিজেই নিজের কাজের ঢোল পিটান। বলে বেড়ায় যে, আমি এ কাজ করেছি সে কাজ করেছি। কিছু এমনও হয়ে থাকে যারা দু'হাতেই তালি বাজিয়ে থাকে কিন্তু কাজের কাজ আসলে কিছুই হয় না। হট্রোগোল অনেক বেশি হয়ে থাকে, প্রচারও অনেক বেশি হয়ে থাকে। আর কতক মানুষ এমনও আছেন যারা দু'হাতেই কাজ করে থাকেন আর তাদের এ ধরনের কোন উদ্দেশ্য থাকে না যে, তাদের কাজকে কেউ প্রত্যক্ষ করবে আর তারা তাকে বাহ্ বাহ্ দেবে। আজ এমনই একজন আহমদীয়াতের সেবক আমাদের অতিথি আর তিনি হচ্ছেন, সৈয়দ আব্দুল হাই শাহ্ সাহেব।

সত্যিকার অর্থে এটি শতভাগ সঠিক কথা। আমি সর্বদা এটিই দেখেছি, একান্ত নিরবে তিনি কাজ করে যেতেন। অসুস্থ ছিলেন, পা ফুলে যেত। একদিন আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, আপনার পা ফুলে যায়, এতে আপনার কষ্ট হয় না? এর উত্তরে তিনি বলেন, কাজ করার সময় কখনো আমি বুঝিই নি। আমি কাজে এতোবেশি ডুবে যাই যে, আমি বুঝতেই পারিনা কি হচ্ছে। আমি দেখেছি, সদর আঞ্জুমানের সভায় তিনি খুবই কম কথা বলতেন, সভায় যখন তিনি কথা বলতেন তাঁর মতামত হতো বস্তুনিষ্ঠ ও সঠিক।

আবার মুবাশ্বের আইয়াজ সাহেবই লিখেন, অধমের তাঁর কাছে আসার সুযোগ হয়েছিল এবং কিছু সময় তাঁর নায়েব হিসেবে কাজ করারও সুযোগ হয়েছে। সর্বদা তাঁকে বাস্তবিক পক্ষে যেমন পেয়েছি তাহলো, চুপ-চাপ স্বভাবের এক মানুষ, সহজ-সরল প্রকৃতির এবং অক্লান্ত পরিশ্রম করা ছাড়াও আরো বহু গুণাবলীর সমাহার ছিলেন তিনি। অফিসে এসেই যেন তিনি কাজের জোয়াল কাঁধে তুলে নিতেন। পাঞ্জাবিতে প্রবাদ আছে **'সার সাটকে কাম কারনা' অর্থাৎ কাজে ডুবে যাওয়া** তিনি এমনই করতেন। অফিসের চিঠিপত্র থেকে নিয়ে রুহানী খাযায়েন এবং পবিত্র কুরআন মজীদের প্রুফ রিডিং-এর কাজ পর্যন্ত সব নিজেই করতেন আর ঈর্ষাযোগ্য ও অনুকরণীয় জামাতের এই সেবক জানতেনই না যে কখন ছুটি হয়ে গেছে আর অন্যরা কখন চলে গেছে। কাজ করতে করতে তার পা ফুলে যেত কিন্তু আল্লাহ্‌র এই বান্দা কেবল কাজেই লেগে থাকতেন

নিঃস্বার্থ নিরহঙ্কারী সহজ-সরল প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। তাঁকে অনেক কাছ থেকে দেখার অধমের সুযোগ হয়েছে। লোক দেখানো লৌকিকতা ও প্রদর্শন তাঁকে আদৌ স্পর্শ করতে পারেনি। তিনি জামাতের ইতিহাসের অনেক বড় একটি উৎস ও ভান্ডার ছিলেন। কাজের চাপ থাকা সত্ত্বেও সর্বদা হাসিখুসি থাকতেন। তিনি দরবেশী স্বভাব এবং বিনয় ও নম্রতার মূর্ত প্রতিক ছিলেন।

আমি দেখেছি, তিনি জামাতের টাকা-পয়সা খুব সতর্কতার সাথে এবং চিন্তা ভাবনা করে বরং কয়েক বার চিন্তা করে খরচ করতেন। এই চেতনা বড় গভীর ছিল যে, জামাতের টাকা যেন কোনভাবেই নষ্ট না হয়। নিজের সহকর্মীদের ক্ষেত্রে স্নেহ এবং তাদের দোষত্রুটি গোপন করা এবং নমনীয়তার দৃষ্টান্ত অনেক বেশি দেখা যেত। দীর্ঘদিন অসুস্থ ছিলেন কিন্তু এই অসুস্থতাকে তিনি নিজের কাজের প্রতিবন্ধক হতে দেন নি।

অতঃপর আরেক সাহেব অর্থাৎ এক মুরব্বী সাহেব লিখেন, তাঁর স্বভাবে আমিত্ব ও অহংকারের লেশমাত্র ছিল না। প্রকৃত অর্থে তিনি একজন নিঃস্বার্থ দরবেশ এবং ফিরিশ্‌তাতুল্য মানুষ ছিলেন।

আরেকজন মুরব্বী সাহেব লিখেন, যখন রুহানী খাযায়েনের কাজ হচ্ছিল সেই সময় এই অধম এক ঘটনার মাধ্যমে জানতে পারে যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতি তাঁর কত দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে। ঘটনা হলো, হেনরি মার্টিন ক্লার্ক সম্পর্কিত মামলায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সব স্থানে বিচারকের নাম ডগলাস লিখেছেন, কিন্তু রুহানী খাযায়েনের পনের তম খন্ডের তরইয়াকুল কুলুব পুস্তকের ৩৪৯ পৃষ্ঠায় বিচারকের নাম জে, আর রিমান্ড এবং স্থানের নাম পাঠান কোর্ট লিখেছেন। এই কাজের জন্য গবেষণা সেল এবং আহমদীয়তের ইতিহাস বিভাগে যারা কাজ করে তাদের কাছেও লিখা হয়েছে যে বিষয়টি আসলে কি। উভয়ের মতামত একই ধরনের ছিল অর্থাৎ তাদের মতে এটি মুদ্রণ প্রমাদ। কিন্তু জনাব শাহ্ সাহেবের সিদ্ধান্ত এটা ছিলো যে, এতো বড় ভুল হতেই পারে না। আর তিনি এর সাথে কোন টিকাও যোগ করেন নি এবং এ ভাবেই থাকতে দিয়েছেন। কিন্তু যখন রুহানী খাযায়েনের ১৮তম খন্ডে নুযূলুল মসীহ্ নিয়ে কাজ হচ্ছিল এতে ৫৭৮ পৃষ্ঠায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) লিখেছেন, আব্দুল হামীদ দ্বিতীয়বার দেড় বছর পর ধরা পড়লে, তাকে সেই কথাই দ্বিতীয়বার জিজ্ঞেস করা হয়েছিল আর সে তখন তার পূর্বের বিবৃতির উপরই প্রতিষ্ঠিত ছিল অর্থাৎ আমি খ্রিস্টানদের শিখানোর পরিপ্রেক্ষিতে বলেছিলাম [অর্থাৎ দ্বিতীয়বার যখন তাকে ধরা হলো তখন বিচারক অন্য ব্যক্তি ছিলেন যার নাম তা ছিলো যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) লিখেছেন, এটা প্রথম নাম ছিল না]।

আবার লিখেন, শাহ্ সাহেব কখনো অস্থির হতেন না আর সর্বদা নিজের সহকর্মীদের সাথে ভালোবাসাপূর্ণ আচরণকারী ছিলেন।

খিলাফত লাইব্রেরী রাবওয়ার লাইব্রেরীয়ান সাহেব লিখেন, তিনি একান্ত মানব হিতৈষী মানুষ ছিলেন। অধম দেখেছে, তিনি জামাতের কাজ কঠোর পরিশ্রম এবং একাগ্রতার সাথে করতেন। অসুস্থতা স্বত্বেও পুরো সময় কাজে লেগে থাকতেন। কয়েক মাস, অনবরত তাঁর পা ফুলে ছিল কষ্টও হতো, হৃদরোগ ছিল।

তিনি লিখেন, কয়েক মাস পূর্বে লন্ডন থেকে বারাহীনে আহমদীয়ার বিভিন্ন সংস্করণ চেক করার নির্দেশ আসে অর্থাৎ আমি (খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস) তাঁকে বারাহীনে আহমদীয়ার বিভিন্ন সংস্করণ চেক করার দায়িত্ব প্রদান করি। মোহতরম শাহ্ সাহেব অধমকে সংবাদ পাঠালেন, লাইব্রেরীয়ান সাহেব বারাহীনে আহমদীয়ার যত সংস্করণ আছে সেগুলোকে একত্র করে একটি বাক্সে রাখুন। আমি সব সংস্করণ একত্র করে বাক্সে ভরে

বললাম, চেক করার জন্য কি নিয়ে আসবো? উত্তরে তিনি বললেন, কেন কষ্ট করতে যাবেন আমি নিজেই আসছি। তার চলাফেরা করাটা খুবই কষ্টকর ছিল তারপরও তিনি নিজেই লাইব্রেরীতে এসেছেন এবং বারাহীনে আহমদীয়ার সমস্ত সংস্করণ চেক করেছেন। তিনি বলছিলেন, এগুলো যেহেতু পুরাতন ছাপা নষ্ট হয়ে যেতে পারে তাই আমি মনে করলাম আমি নিজেই এসে চেক করে যাই আর লাগাতার কয়েক ঘন্টা ধরে নিজেই চেক করেন।

আমাদের আরবী ডেস্কের মুহাম্মদ আহমদ নঈম সাহেব লিখেন, যে যুগে কম্পিউটারও ছিলো না; তফসিরে কবীরের বিস্তারিত সূচী তৈরী করা খুবই শ্রমসাধ্য ও গভীর দৃষ্টির দাবী রাখত যা তিনি অত্যন্ত কষ্ট করে প্রস্তুত করেছেন। তাঁর বিনয় দেখুন! বর্তমান রূহানী খাযায়েনের কয়েকস্থানে মুদ্রণ জনিত ভ্রান্তি রয়েছে আর অনুবাদের সময় তাঁর সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি যেখানে ভুল ছিল তা সানন্দে স্বীকার করেন আর যেখানে কোন ব্যাখ্যা সম্ভব ছিল তা যথাযথভাবে ব্যাখ্যা করতেন এবং খুব দ্রুত এমনসব প্রশ্নের উত্তরও তৈরী করে পাঠাতেন। প্রুফ রিডিং এর জন্য তিনি অনেক শ্রম দিয়েছেন কিন্তু তারপরও মানবীয় দুর্বলতার কারণে কিছু কিছু ভুল থেকেই যায় । কিন্তু এর জন্য তাঁর খুবই কষ্ট হতো যে এতো সুন্দর প্রিন্টিং হচ্ছে এতে ভুল থাকাটা উচিত নয়।

আমাদের এক মুরব্বী সিলসিলাহ্ কলীম আহমদ তাহের সাহেব বলেন, আমি ১১ বছর ধরে তাঁকে সর্বদা কাজে নিমগ্ন পেয়েছি, তিনি খুবই নিরব কর্মী ছিলেন আর প্রত্যেক কাজ নিরলসভাবে আর দায়ীত্বশীলতার সাথে করতেন। আশ্চার্যান্বিত হতে হয় যে, এই বয়সেও তিনি এতো কাজ করতেন মাশাআল্লাহ্। অফিসের নির্ধারিত সময়ের পরও সন্ধ্যায় আরবী বোর্ডের সভায় অংশগ্রহণ করতেন। তিনি রূহানী খাযায়েনের কাজের সময় সমস্ত পুস্তকের প্রতিটি শব্দের প্রুফ রিডিং করেছেন। মোটকথা তিনি অনেক জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন এবং অনেক পরিশ্রমী ওয়াকফে যিন্দেগী ছিলেন। তিনি পুরনো মুবাল্লেগদের বলতেন, আমি সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার সেই সময়ও দেখেছি, যখন জীবন ছিল খুবই অনাড়ম্বর মিতব্যয়িতার কারণে অনেক সুযোগ সুবিধা ছিল না যা আজকের প্রেক্ষাপটে আর বাহুল্য মনে করা হয় না। আর পুরনো দপ্তর ও ছাদের দিকে ইশারা করে বলতেন, এখনতো সব জায়গায় বৈদ্যুতিক ফ্যান চলছে, তখন সেখানে একটা পাইপ লাগানো ছিল আর সেটির উপর একটি ফ্যান ঝুলত যার সাথে রশি বাধা থাকত, যখনই বাতাসের প্রয়োজন হতো সেই রশিকে টানা হতো, কোন বিদ্যুৎ ছিল না, কোন সুযোগ সুবিধা ছিল না।

তিনি আরও বলেন, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) অধিকৃত কাশ্মীরের কোন এলাকায় একটা বার্তা পৌঁছানোর জন্য তাঁকে পাঠিয়েছিলেন, যখন তিনি রাওয়ালপিন্ডি পৌঁছলেন দেখলেন সেখানে কোন বাহন নেই, যদি তিনি কোন বাহনের অপেক্ষা করতেন তাহলে দেরী হয়ে যেত। তাই খলীফাতুল মসীহ্র আদেশ যথাসময় পালনের উদ্দেশ্যে তিনি রাওয়ালপিন্ডি থেকে পায়ে হেটে রওয়ানা হন, আর পায়ে হেটেই ফিরে আসেন এবং হুযূরের বাণী নির্দিষ্ট জায়গায় যথাযথভাবে পৌঁছে দেন।

তাঁর একটা পালক মেয়েও ছিল যার বিয়ে হয়েছে এক মুরব্বীর সাথে। তাকে তিনি নিজের কন্যার মতো রেখেছিলেন। পরেও সর্বদা তার খোঁজ খবর রাখতেন, উপহার-উপঢৌকন পাঠাতেন, ঘরে স্ত্রী-সন্তানদের সাথে খুবই উত্তম ব্যবহার করতেন। সন্তানরা বলেন, আমরা কখনো তাঁকে উচ্চস্বরে কথা বলতে বা বকাঝকা করতে শুনিনি। সন্তানদের আত্মসম্মান বোধের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন আর খুবই উত্তম ভাবে তরবীয়ত করেছেন। জীবনের সকল পর্যায়ে সরলতা অবলম্বন করতেন। আত্মপ্রচার খুবই অপছন্দ করতেন। প্রত্যেক কাজে ধৈর্যের মূর্তিমান প্রতীক ছিলেন। অসুস্থতা হোক বা অন্য কোন দুঃশ্চিন্তাই হোক কখনো নিজের কষ্টের কথা প্রকাশ করতেন না। এমন পর্যায়ের ধৈর্য ছিল যে, তাঁর মা অধিকৃত কাশ্মীরে ছিলেন, তাঁর মৃত্যুর খবর যখন পত্র মারফত জানতে পারলেন তখন পরম ধৈর্যের সাথে আঘাত সহ্য করেছেন এবং কয়েকদিন পর্যন্ত কারো কাছে উল্লেখ পর্যন্ত করেন নি।

অত্যন্ত অতিথি পরায়ণ ছিলেন, জলসা সালানা উপলক্ষে যখন কাশ্মীর থেকে অতিথিরা আসতেন তখন সমস্ত ঘর তাদের জন্য ছেড়ে দিয়ে নিজে সন্তান-সন্ততিদের নিয়ে একটি স্টোর রুমে চলে যেতেন। নিজের ওয়াক্‌ফ এর অঙ্গীকার পূরণের চেষ্টায় সবসময় সচেষ্ট ছিলেন। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত এ ব্যাপারে চিন্তিত ছিলেন। শেষের কয়েক বছরে তিনি কয়েকবার দেশের বাহিরে নিজের সন্তানদের কাছে যান, তাঁর সব ছেলেই দেশের বাহিরে থাকেন। তাঁর বড় ছেলে আহমদ ইয়াহিয়া সাহেব যিনি হিউম্যানিটি ফার্স্ট এর চেয়ারম্যান। যখন সন্তানদের কাছে যেতেন তখন আত্মীয়-স্বজন ও সন্তানরা জোর দিয়ে বলতো, এখানে থেকে যান। তখন তিনি বলতেন, আমি জীবন উৎসর্গ করেছি সামান্য কিছু সময় উৎসর্গ করিনি। তাঁর পায়ে খুবই সমস্যা ছিল সবসময় পা ফোলা থাকতো যেভাবে আমি বলেছি, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি রীতিমত অফিসে যেতেন, এবং নিজের কাজের কোন ক্ষতি হতে দিতেন না। অন্তিম রোগে অসুস্থ অবস্থায় পাঁচবার হাসপাতালে গিয়েছিলেন, কিন্তু প্রত্যেকবার ডাক্তারের কাছে এ প্রশ্ন করতেন, আমি কখন দপ্তরে যেতে পারব। মৃত্যুর দু' তিনদিন পূর্বে দপ্তরে গিয়েছিলেন এবং সেখানে বসে কাজ করছিলেন, এমতাবস্থায় তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন, আর সেখান থেকে সোজা হাসপাতালে যান চেক আপ করাতে, বারোটায় চেক আপ করাতে গেলে ডাক্তারগণ তাঁকে ভর্তি করে নেন। সেখানেও তিনি বিছানায় শুয়ে দপ্তরের কাজ চেক করতেন, সহকর্মীগণ কাগজপত্র নিয়ে আসতেন এবং তিনি কাজ করে যেতেন। শেষ দিন তিনি বললেন, দোয়া করুন আল্লাহ্ সুরক্ষাকারী ও সাহায্যকারী হোন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, তাঁর মৃত্যুর সময় নিকটবর্তী। বললেন, আমার ফ্লাইটের সময় হয়ে গেছে। এখান থেকে কোন ফ্যাক্স গেলে, নিজের হাতে তার উত্তর দিতেন। তাঁর শেষ চিঠি যা তিনি আমাকে লিখেছেন তাও নিজের হাতে লেখা ছিল কোন কেরানী দিয়ে লেখাননি, আর কম্পোজও করাতেন না, এবং খুবই সুন্দরভাবে ধীরে ধীরে লিখতেন, অথচ দুর্বলতার কারণে তাঁর হাত কাঁপত, তবুও যথেস্ট সময় ব্যয় করে তিনি লিখতেন। ১৪ ডিসেম্বর বেলা সাড়ে এগারটা পর্যন্ত অফিসে ছিলেন। তারপর তিনি ইন্তেকাল করেন। যেমন পূর্বে বলা হয়েছে, তাঁর কর্মস্থলে মুত্যু বরণের ইচ্ছা ছিল।

হাসপাতালে তিনি বলেছিলেন, আমার ইচ্ছা রূহানী খাযায়েনের সমস্ত ভুলগুলো সংশোধনের কাজ সম্পূর্ণ করে দায়িত্বমুক্ত হবো, কিন্তু সেই সুযোগ তিনি পান নি। একজন মুরব্বী সিলসিলাহ্ যিনি তাঁর অফিস অর্থাৎ ইশায়াতের অফিসে কর্মরত আছেন তিনি লিখেছেন, **'আব্দুল হাই শাহ্ সাহেবের ভায়রা ভাই আমাকে বলেছেন, ১৭ ডিসেম্বর আব্দুল হাই শাহ্ সাহেব স্বপ্নে দেখেন, তাঁর স্ত্রী এসেছেন এবং তাঁকে জিজ্ঞাসা করছেন, "আপনি কি এখনও টিকেট নেন নি?" শাহ্ সাহেব বলছেন, এখনও নেই নি। কিছুক্ষণ পর শাহ্ সাহেব তাঁর স্ত্রীকে বললেন, হ্যাঁ, আমিও টিকেট নিয়ে নিলাম এবং বোর্ডিংও হয়ে গেছে।'**

যেদিন শাহ্ সাহেব মারা গেলেন ঐদিন সকাল প্রায় দশটার সময় দু'জন বন্ধু হাসপাতালে তাঁকে দেখতে গিয়েছিলেন। সেখানে গিয়ে তারা জানতে পারলেন, ডাক্তাররা বলেছেন, আমাদের জন্য যা করা সম্ভব ছিল তার সবই করেছি। তারপর তিনি তাঁর ছেলে ইমরানকে ডাকলেন এবং আস্তে করে বললেন ফ্লাইট এসে গেছে? ছেলে বুঝতে পারল না, বুঝবার জন্য আরো কাছে গেল। কিন্তু ততক্ষণে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন আর কিছু বলতে পারেন নি।

জামাতের এই সেবক শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত জামাতের কাজের জন্য নিবেদিত ছিলেন। যতদূর সম্ভব অন্য সকল কাজের উপর জামাতের কাজকে অগ্রাধিকার দিতেন। শাহ্ সাহেব ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করেছিলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বইগুলো পড়েছিলেন এবং তা পালনও করেছিলেন। কেবল জ্ঞান অর্জনই করেন নি, যেমন অনেকে বলেছেন, আমিও বললাম, তিনি আল্লাহ্‌র প্রাপ্য আল্লাহ্‌কে এবং বান্দার প্রাপ্য বান্দাদের প্রদানে সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। আমি যখন নাযেরে আলা ছিলাম, তখনও আমি তাঁকে সম্পূর্ণ আনুগত্যকারী পেয়েছি তখন তিনি নাযের ইশায়াত ছিলেন। এরপর যখন আল্লাহ্ তা'লা আমাকে খিলাফতের পোশাক পরিধান করালেন তখন তাঁকে নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততায় অনেক অগ্রগামী পেয়েছি যা ছিল পূর্বের তুলনায় অনেক বেশী আর এমনটাই তো হওয়ার কথা। খিলাফতের সাথে সম্পর্কই ভিন্ন হয়ে থাকে। তিনি বয়আতের প্রকৃত মর্ম বুঝতেন এবং পরম আন্তরিকতার সাথে এর সুবাদে অর্পিত দায়িত্ব পালন করতেন। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধি করুন। যুগ খলীফাকে, আহমদীয়া খিলাফতকে এমন অগণিত নিবেদিত প্রাণ সাহায্যকারী সেবক দান করুন, আমীন।

এখন জুমুআর নামাযের পরে তাঁর গায়েবানা জানাযা পড়াব ইনশাআল্লাহ্। সাথে আরো কয়েকটি গায়েবানা জানাযা রয়েছে।

প্রথমটি ইমতিয়ায বেগম সাহেবার যিনি মোহতরম মওলানা মোহাম্মদ মনোয়ার আহমদ মরহুমের স্ত্রী। মওলানা মনোয়ার মরহুম পূর্ব আফ্রিকার মোবাল্লেগ ছিলেন। ১৫ ডিসেম্বর তিনি ইন্তেকাল করেছেন, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। ১৯৩৬ ইং সনে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ২৪ নভেম্বর ১৯৫২ ইং তারিখে মওলানা মোহাম্মদ মনোয়ার সাহেবের সাথে তার বিয়ে হয়। বিয়ের পর থেকে মওলানা সাহেবের অবসর গ্রহণ পর্যন্ত মাঝে ৩/৪ বছর ব্যতীত পুরো সময় তিনি তার ওয়াক্‌ফে যিন্দেগী স্বামীর সাথে কেনিয়া, তাঞ্জানিয়া, ফিলিস্তিন এবং নাইজেরিয়াতে সেবারত ছিলেন। মওলানা মোহাম্মদ মনোয়ার সাহেব

“একজন ন্যায় পরায়ণ স্ত্রীর স্মরণে” বইতে তাঁর দু’জন স্ত্রীর সুসম্পর্কের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)’ও এই কিতাবের অনেক প্রশংসা করেছেন অর্থাৎ এভাবে সুসম্পর্ক বজায় রাখা উচিত। মওলানা মোহাম্মদ মনোয়ার সাহেবের প্রথমা স্ত্রীকে দ্বিতীয় স্ত্রী (মরহুমা) সর্বদা আপা বলে সম্বোধন করতেন। তিনি কখনো তার জন্য সতীন শব্দ ব্যবহার করতেন না। না কখনো তিনি নেতিবাচক আচার-আচরণ প্রদর্শন করেছেন। উভয় স্ত্রীর পারস্পরিক ব্যবহার ছিল অতি উন্নত। একজন আরেকজনের সন্তানদের এত আন্তরিকতার সাথে দেখাশুনা করতেন যে, অনেকেই তাদের ছেলে-মেয়েদের জিজ্ঞাসা করতো এদের দু’জনের মধ্যে তোমার আপন মা কে? অন্যের আর্থীক দৈন্যতা দূর করার জন্য অসংখ্যবার নিজের পেনশন উঠিয়ে এবং অনেকবার অন্যের কাছ থেকে ঋণ করে অভাবীদের সাহায্য করতেন। তার ছেলে মোবারক আহমদ তাহের সাহেব যিনি নুসরত জাহাঁ রাবওয়ার সেক্রেটারী পদে কর্মরত আছেন, তিনি বলেন, ধর্মের সেবার গভীর একাগ্রতা, নির্ভীক এবং অত্যন্ত সাহসী মহিলা ছিলেন। আহমদী, গয়ের আহমদী সকলকেই সমানভাবে সাহায্য করতেন। মোবারক আহমদ তাহের সাহেব প্রথম মায়ের গর্ভে জন্ম নিয়েছেন। মওলানা মোহাম্মদ মনোয়ার সাহেবের যে স্ত্রী মারা গেছেন অর্থাৎ মোবারক সাহেবের এই মায়ের ঘরে তার বোনও আছেন। এক মেয়ে আমাতুন নূর তাহেরা সাহেবা যিনি মুবাল্লেগ সিলসিলাহ্ আব্দুর রাজ্জাক সাহেবের স্ত্রী। আল্লাহ্ তা’লা মরহুমার মর্যাদা উন্নীত করুন এবং তার সৎকর্মসমূহ তার বংশধরগণের মাঝে প্রতিষ্ঠিত থাকবে এটিই আমাদের প্রত্যাশা।

পরবর্তী জানাযা হচ্ছে, সিস্টার ওয়াসিম বেগম সাহেবার যিনি আমেরিকার মোকাররম কামালুদ্দীন কাহলুঁন সাহেবের মেয়ে। তিনি ৬ ডিসেম্বর ৮৩ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেছেন, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। তিনি লাজনা ইমাইল্লাহ্ ক্লিভল্যান্ডের প্রেসিডেন্ট ছাড়াও জামাতের বিভিন্ন পদে থেকে সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। তিনি অত্যন্ত পুণ্যবতী মহিলা ছিলেন এবং জামাতের প্রতি গভীর ভালবাসা রাখতেন। স্থানীয় আমেরিকান ছিলেন। তিনি স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে স্বামী এবং দুই ছেলে রেখে গেছেন।

পরবর্তী জানাযা গায়েব হচ্ছে ক্যালগরী জামাতের আমাতুর রহমান সাহেবার। যিনি ৬১বছর বয়সে ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। অত্যন্ত নেক, মুত্তাকী, ইবাদত-বন্দেগীতে অভ্যস্ত মহিলা ছিলেন। ওমরাহ্ পালনেরও সৌভাগ্য লাভ করেন। পবিত্র কুরআন এবং মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পুস্তকের সাথে তার গভীর সম্পর্ক ছিল। মরহুমা মূসী ছিলেন।

পরবর্তী জানাযা আমেরিকার সৈয়দা ওয়াসীমা বেগম সাহেবার যিনি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)’র বড় মামা মরহুম হযরত সৈয়দ ওলীউল্লাহ্ শাহ্ সাহেবের বড় মেয়ে। তিনি ৮৪ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি মাশাআল্লাহ্ অসংখ্য গুণাবলীর অধিকারিণী ছিলেন। প্রত্যেক খুতবার পরে আমার কাছে তাঁর ফোন আসত। আমাকে বিশেষভাবে দোয়ার জন্য বলতেন। নিজের সন্তানদেরও সঠিক রাস্তায় চলার ও প্রতিষ্ঠিত থাকার নসিহত করতেন। তাঁর এক ছেলে নাজিম ফাইয়ায সাহেব আমেরিকার একটি

জামাতের প্রেসিডেন্ট। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর মর্যাদা উন্নীত করুন এবং তাঁর পুণ্য যেন তাঁর সন্তানদের মাঝেও প্রতিষ্ঠিত থাকে।

পরবর্তী গায়েবানা জানাযা মিয়া আব্দুল কাইয়ুম সাহেবের যিনি কোয়েটার মোকাররম মিয়া ওযীর মাহমুদ সাহেবের ছেলে। ইনি ৬ ডিসেম্বর ৮৮ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে তার স্বতঃস্ফূর্ত ভালবাসা ছিল। খিলাফতের সাথে খুবই গভীর সম্পর্ক ছিল। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) তার বিবাহ পড়ান। এবং উকিলের দ্বায়িত্বও তিনি স্বয়ং পালন করেন।

মুহাম্মদ মোস্তফা সাহেব করীচর উরুনগী টাউনের অধিবাসী। তিনি ২৭ সেপ্টেম্বর ইন্তেকাল করেন, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। ১৯৭১ সালে আহমদীয়াত গ্রহণ করেন। বংশে তিনি একাই আহমদী ছিলেন। আহমদী হওয়ায় পর তাঁকে অনেক সমস্যা ও কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়। ভাইয়েরা তাঁকে বেঁধে গ্রামবাসীদের সামনে তাঁর উপর কঠোর নির্যাতন করে। আহ্মদীয়াত গ্রহণ করার আগে তিনি আহমদীয়াতের কঠোর শত্রুদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। কিন্তু আহমদী হওয়ার পর তিনি একেবারেই বদলে যান এবং জামাতের সাথে তিনি সর্বদা নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সম্পর্ক রাখেন। তিনি তাঁর হালকায় সেক্রেটারী তা'লীমুল কুরআন, মুরব্বী আতফাল, সেক্রেটারী দাওয়াতে ইলাল্লাহ্ ছিলেন এবং স্থানীয় মুয়াল্লেম হিসেবে সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করেন। অগণিত আতফাল, আনসার, নাসেরাত, লাজনাদের পবিত্র কুরআন নাযেরা এবং অনুবাদ পড়িয়েছেন। কুরআন করীমের বেশীরভাগই তাঁর মুখস্থ ছিল। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী ছাড়াও স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে এক ছেলে, নাবিদ মুস্তফাকে রেখে গেছেন, যিনি জামাতের একজন মুরব্বী।

চাকওয়ালের নাযির আহমদ সাহেব ২১ জুলাই মারা যান। তিনি গায়েবানা জানাযা পড়ানোর জন্য আবেদন করেছিলেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী মালেক করম দ্বীন সাহেব (রা.)'র ছেলে ছিলেন। ১৯৩০ সালে তার পিতা তাকে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর সেবার জন্য কাদিয়ান রেখে যান, সেখানে তিনি ১৭ বছর অবস্থান করে অসাধারণ সেবা করেন। তিনি মূসী ছিলেন। অত্যন্ত নিষ্ঠাবান এবং খিলাফতের প্রতি গভীর ভালবাসা রাখতেন।

ফতেহ্ মুহাম্মদ খাঁন সাহেব ২৮ নভেম্বর মৃত্যুবরণ করেন। তিনি অত্যন্ত নেক এবং ভদ্র মানুষ ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি পাঁচ মেয়ে এবং তিন ছেলে রেখে যান। তার ছেলে মুকাররম হাফিয বুরহান মুহাম্মদ সাহেব ওয়াকফে যিন্দেগী, জামেয়া আহ্মদীয়ার শিক্ষক এবং এক জামাতা হলেন মীর আব্দুর রশীদ তাবাস্সুম সাহেব। মরহুম সিলসিলাহ্র মুরব্বী ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লা এই সকল মরহুমের পদমর্যাদা উন্নীত করুন, তাদের পরিবার ও আত্মীয়-স্বজনকে ধৈর্য, দৃঢ় মনোবল ও সাহস দান করুন। তাদেরকে পুণ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখুন এবং নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সাথে জামাতের সেবা করার সৌভাগ্য দান করুন। যেভাবে আমি বলেছি, জুমুআর নামাযের পরে এদের সকলের গায়েবানা জানাযা পড়ানো হবে।

(জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ ও বাংলা ডেস্কের যৌথ প্রচেষ্টায় অনূদিত)